দ্বিতীয় অধ্যায়

বিবর্তনে প্রাণের স্পন্দন

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের পর

খটকা যে লাগছিলো না তা তো নয়। সব কিছুতেই গরমিল, চোখ মেলে একটু বৈজ্ঞানিকভাবে চিন্তা করতে গেলেই কোথায় যেনো গন্ডগোল বেঁধে যাচ্ছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রকৃতিবিদ, বিজ্ঞানী এবং ভূতত্ত্ববিদেরা বারবারই যেনো হোঁচট খেয়ে পড়ছিলেন চারপাশের অসংখ্য পরিচিত এবং অপরিচিত প্রাণের সমাহার কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। তথাকথিত এই মহান সৃষ্টির মধ্যে এত অনাসৃষ্টি কেনো, কেনো এতো অযথা অপচয়, কেনো দেখলে মনে হয় এর পিছনে আদৌ কোন পরিকল্পনা বা প্ল্যান নেই? অবস্থাটা দাঁড়ালো অনেকটা কুয়োর ব্যাঙের মত, কুয়ো থেকে বের না হলে তো আর বাইরের পৃথিবীর নতুন নতুন জিনিষগুলো পরখ করে দেখা যাচ্ছে না, আবার কুয়ো থেকে বের হওয়ার পথটাও যে কেউ বাতলে দিচ্ছে না। ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে আমাদের এই পৃথিবীর বয়স বহু কোটি বছরের কম নয়, বিজ্ঞানীরা তখনও জানতেন না পৃথিবীর আসল বয়স কত, পৃথিবীর বয়স হিসেব করে বের করার মত প্রযুক্তি তখনও তাদের হাতে ছিলো না, কিন্তু ভুতত্ত্বের বিভিন্ন স্তর এবং ফসিল দেখে বুঝতে পারছিলেন যে এর বয়স বহু কোটি বছরের কম নয় (অনেক পরে, ১৯০৫ সালে *রেডিওমেট্রিক ডেটিং* আবিষ্কৃত হওয়ার পরও বেশ পরে বিজ্ঞানীরা হিসাব করে বের করেন যে, পৃথিবীর বয়স আসলে প্রায় সাড়ে চারশো কোটি বছর)। ফসিলগুলোও চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে জীবজগতের সুদীর্ঘ ক্রমবিকাশের ইতিহাস! কিন্তু বাইবেল তো বলছে, মাত্র কয়েক হাজার বছর আগে সৃষ্টি করা হয়েছে সব গ্রহ, তারা, নক্ষত্রসহ আমাদের এই পৃথিবী, প্রকৃতিতে বিরাজমান সব প্রাণ একটি একটি করে সৃষ্টি হয়েছে সৃষ্টিকর্তার হাতে, আর তারপর তারা সেভাবেই রয়ে গেছে, বদলায়নি একটুও, আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত তারা থেকে যাবে অপরিবর্তনীয়! এই শাশ্বত স্থায়িত্বের তত্ত্ব যেন সিন্দাবাদের ভুতের মতই ঘাড়ে চেপে বসেছিলো। ষোড়শ শতাদীতে কোপার্নিকাস মানুষের কল্পনায় তৈরি স্থির পৃথিবীকে সূর্যের চারদিকে ঘুড়িয়ে দিলেন, ব্রুনোকে আগুনে পুড়তে হলো এই ঘুর্নায়মান পৃথিবীর তত্ত্বকে সমর্থন করার জন্য। কিন্তু জীববিজ্ঞান ঘুরপাক খেতে থাকলো সেই কাল্পনিক কয়েক হাজার বছরের অপরিবর্তনশীল এবং স্থবির প্রাণের আবর্তের ভিতরেই।

কিন্তু সেই প্রাচীন কালেই কি গ্রীক দার্শনিকদের মনে সন্দেহ জাগেনি প্রজাতির স্থিরতা নিয়ে? তাদের কেউ কেউ তখনই তো প্রস্তাব করেছিলেন যে প্রজাতি আসলে পরিবর্তনশীল, এক প্রজাতি থেকেই হয়তো আরেক প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে! তাহলে তারপর কি হলো? আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় যে, খ্রিষ্টীয় ধর্ম তত্ত্বের অন্ধকুপে আবদ্ধ হয়েই আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিলো দীর্ঘ দুই হাজার বছর! কিন্তু মানব সভ্যতার ইতিহাসের পাতাগুলো একটু মনযোগ দিয়ে উল্টালে দেখা যায় যে, এই স্থির বিশ্ব বা অপরিবর্তনশীলতার দর্শনের আসল নাটের গুরু আমাদের বিশ্বজোড়া পূজনীয় দার্শনিকদ্বয়, প্লেটো এবং এরিস্টোটল ছাড়া আর কেউ নয়। এরিস্টোটল তার গুরু প্লেটোর মতই প্রাণশক্তি, স্থবির মহাবিশ্ব, স্থির এবং অপরিবর্তনশীল প্রজাতিতে আস্থাবান ছিলেন। তার মতে, বিশ্বজগতের সব কিছুর পিছনে একটা উদ্দেশ্য ঠিক করা আছে আর এই উদ্দেশ্যের মূলে রয়েছে অপরিবর্তনশীলতা [১]। সব কিছুর 'বিদ্যমান স্বভাব ধর্ম' জানাটাই নাকি বিজ্ঞান! মানব সভ্যতা তার এই স্থবির জাগতিক দর্শনের বোঝা বয়ে বেড়িয়েছে প্রায় দুই হাজার বছর! বার্ট্রান্ড রাসেল তার 'পশ্চিমা দর্শনের ইতিহাস' বইতে এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে,

এরিস্টোটলের এই মতবাদ বিজ্ঞান এবং দর্শনের জন্য পরবর্তীতে বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো [২]। তারপর যত বড় বড় বুদ্ধিবৃত্তিক অথবা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ঘটেছে তাদের প্রায় সবাইকেই কোন না কোন ভাবে কোন না কোন এরিস্টোটলীয় মতবাদকে উৎখাত করে এগুতে হয়েছে। এখনও পর্যন্ত পৃথিবী জুড়ে তারই ধারাবাহিকতা দেখতে পাচ্ছি আমরা।

আঠারশ শতাব্দীর কার্ল লিনিয়াসকে (১৭০৭-১৭৭৮) জীবের শ্রেনিবিন্যাসের জনক বলে ধরা হয়, তিনিই প্রথমবারের মত জীবের শ্রেনিবিন্যাসের একটি সাধারণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তৈরী করেন। লিনিয়াসও তখনকার দিনের রেওয়াজ অনুযায়ী একজন প্রকৃতিবিদ হিসেবে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর শ্রেনীবিন্যাস করে স্রষ্টার তুষ্টি লাভেই বেশী আগ্রহী ছিলেন [৩]। এমনকি প্রথম জীবনে তিনি মনে করতেন যে প্রজাতিরা উৎপত্তির লগ্ন থেকে অপরিবর্তনীয় অবস্থায়ই রয়ে গেছে, যদিও পরবর্তীতে এই মত কিছুটা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি বললেন, এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতির হয়তো সৃষ্টি হয় এবং ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রকৃতিতে অনবরত সংগ্রামও চলে, তবে এর সব কিছুই ঘটে স্বর্গীয় নির্দেশে। বিজ্ঞানীরা গত ২০০ বছর ধরে লিনিয়াসের এই শ্রেনীবিন্যাসের পদ্ধতিকে (অল্প কিছু পরিবর্তনসহ) স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে ব্যবহার করে আসছেন। শুধুমাত্র পার্থক্য এই যে, লিনিয়াস এই মডেল আবিষ্কার করেছিলেন মহান স্রষ্টার সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করার জন্য আর আজকের বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন জীবকে বিভিন্ন শ্রেনীতে ভাগ করেন তাদের মধ্যকার সঠিক বিবর্তনীয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ।

জীবের বিবর্তনবাদ তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রা শুরু হয় আসলে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ব্রিটিশ প্রকৃতিবিদ চার্লস ডারউইনের (১৮০৯- ১৮৮২) হাত ধরে। তিনি বললেন,

> *কোন প্রজাতিই চিরন্তন বা স্থির নয়, বরং এক প্রজাতি থেকে পরিবর্তিত হতে হতে আরেক প্রজাতির জন্ম হয়, পৃথিবীর সব প্রানই কোটি কোটি বছর ধরে তাদের পুর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হতে হতে এখানে এসে পৌঁছেছে।*

বিবর্তনের ইতিহাসের বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে কয়েকশ কোটি বছর পিছনে গেলে দেখা যাবে যে মানুষ সহ সকল জীবেরই আদি উৎপত্তি হয়েছিল সেই একই আদিম এক কোষী প্রাণী থেকে, তার পর নানা ভাবে, নানা প্রজাতির মাধ্যমে তা বিবর্তিত হয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ডারউইনের দেওয়া এই বিবর্তন তত্ত্বটি আজকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত; এটি অত্যন্ত সফল একটি তত্ত্ব যা সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আজকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারণ তিনি অন্যদের মত শুধু একটি ধারণা প্রস্তাব করেই ক্ষান্ত হননি, বিবর্তনের এই প্রক্রিয়াটি কিভাবে কাজ করে তার পদ্ধতিও বর্ণনা করেছেন সবিস্তারে, প্রথমবারের মত। কিন্তু উনবিংশ শতকের সেই সময়ে রক্ষণশীল খ্রীষ্ট ধর্মের প্রবল প্রতাপে প্রকৃতিবিজ্ঞান যখন মুখ থুবড়ে পড়ে ছিল তখন ডারউইন এরকম একটি বৈপ্লবিক মতবাদ দিতে পারলেন কিভাবে? আসলে ডারউইনের আগের হাতেগোনা কয়েকজন সাহসী পুর্বসুরী ইতিমধ্যেই কাজ কিছুটা এগিয়ে নিয়েছিলেন; পৃথিবী তখন অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলো এমন একজনের জন্য, যিনি তখন পর্যন্ত পাওয়া, বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন তথ্য এবং সিদ্ধান্তগুলোকে এক বিনি সুতোর মালায়

গেঁথে জীববিজ্ঞানকে এগিয়ে দেবেন তার পরবর্তী স্তরে। তিনিই হলেন চার্লস রবার্ট ডারউইন।

তাই, ডারউইনের গল্পে আসার আগে তার এই পূর্বসুরীদের কয়েকজনের অবদান সম্পর্কে দু' একটি কথা না বলে নিলে বিবর্তনের ইতিহাসের গল্পটি হয়তো অসম্পূর্ণই রয়ে যাবে। প্রথমেই বলতে হয় ফরাসী জীববিজ্ঞানী জ্যাঁ ব্যাপ্তিস্তে ল্যামার্কের (১৭৪৪-১৮২৯) কথা। মজার ব্যাপার হচ্ছে, জীববিজ্ঞানে ল্যামার্ক তাঁর অবদানের জন্য যতখানি পরিচিত, তার চেয়ে ঢের বেশি পরিচিত বিবর্তনতত্ত্ব নিয়ে তার ভুল মতবাদের কারণে। ল্যামার্ক সঠিকভাবেই সিদ্ধান্তে আসেন যে, প্রজাতি সুস্থির নয়, এক প্রজাতি থাকে আরেক প্রজাতির বিবর্তন ঘটে, তবে তিনি যে পদ্ধতিতে এই পরিবর্তন ঘটে বলে ব্যাখ্যা দেন তা পরবর্তীতে সম্পূর্নভাবে ভুল বলে প্রমানিত হয়। কিন্তু এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, ল্যামার্কই হচ্ছেন প্রথম বিজ্ঞানী যিনি প্রজাতির স্থিরতাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে চ্যালেঞ্জ করে বিবর্তনের চালিকাশক্তি এবং পদ্ধতি সম্পর্কে একটি যুক্তিযুক্ত উত্তর খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিলেন। তার মতবাদ সাড়া পৃথিবী জুড়ে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়, এবং এখনও প্রায়ই দেখা যায় যারা বিবর্তন সম্পর্কে ভাসা ভাসা ধারনা রাখেন তাদের অনেকেই ল্যামার্কিয়ান মতবাদকে ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্বের সাথে গুলিয়ে ফেলেন। ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্বের সাথে ল্যামার্কিয়ান দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো পরবর্তী অধ্যায়ে। ডারউইনের দাদা ডঃ ইরেমাস ডারউইনও (১৭৩১ - ১৮০২) ছিলেন একজন প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ এবং জীবের বিবর্তনের মতবাদের সক্রিয় সমর্থক। তিনি কোন ধর্মীয় বিধি বিধানে বিশ্বাস করতেন না, তবে মনে করতেন যে, এক পরমেশ্বরের নির্দেশেই জীব জগৎ, তার চারদিকের প্রতিকুল প্রকৃতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য, অনবরত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, আর এই পরিবর্তন চলছে বাইবেলে বলা কয়েক হাজার বছর নয়, বরং বহু কোটি বছর ধরে। এ দু'জন ছাড়াও জর্জ বুঁফো, সেন্ট-ইলার, রবার্ট চেম্বার্স, শ্লিখার, উঙ্গার, হার্বার্ট স্পেন্সর, শোপেন হাওয়ার সহ অনেক ডারউইন-পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীদের নাম করা যায় যারা বুঝতে পেরেছিলেন প্রজাতি আসলে স্থিতিশীল নয়। এরা বিবর্তনকে বাস্তবতা হিসেবে মেনে নিলেও এর প্রক্রিয়া কি তা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি।

এবার আসা যাক, প্রখ্যাত ভুতত্ত্ববিদ চার্লস লায়েলের (Charles Lyell, ১৭৯৫ - ১৮৭৫) কথায়, ডারউইনের বিবর্তনবাদ মতবাদের আবিষ্কারের পিছনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ডারউইন লায়েলের এর লেখা 'Principle of Geology' বইতে ভুতত্ত্বের সদাপরিবর্তশীলতার ধারনা দিয়ে খুবই প্রভাবিত হন। লায়েল বললেন,

> নূহের আমলের এক মহাপ্লাবন দিয়ে পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন হয়নি, বরং হয়েছে ধীরে ধীরে বহু কোটি বছর ধরে প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর কারণে- বৃষ্টি, আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্নুৎপাত, ভূমিকম্প, বাতাসের মত অসংখ্য প্রাকৃতিক শক্তি যুগে যুগে ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন ঘটিয়ে এসেছে এবং এখনও একইভাবে এই পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

যদিও লায়েলই প্রথম এই মতবাদটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন, তার মতবাদের বেশীরভাগ অংশই এসেছিলো তার পূর্বসূরী ভুতত্ত্ববিদ, ইতিহাসের পাতায় প্রায় হারিয়ে যাওয়া, জেমস হাটনের দেওয়া মতবাদ থেকে। সে গল্প আপাতত তোলা থাকলো পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য। লায়েলের এই মতবাদ তখনকার সমাজে তীব্রভাবে সমালোচনার সম্মুখীন হলেও পরবর্তিতে তা ডারউইনকে খুবই প্রভাবিত করে। অনেকেই মনে করেন যে লায়েলের এই মতবাদ সামনে না থাকলে ডারউইন এত সহজে বিবর্তনবাদের পক্ষে তার যুক্তি এত বলিষ্ঠভাবে খাড়া করতে পারতেন না। ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের পিছনে লায়েলের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অবদান এতখানিই যে, তাকে ছাড়া এই গল্প বলা একরকম অসম্ভবই বলতে হবে, তাই পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে দেখা যাবে তাঁর প্রসংগ বারবারই সামনে এসে পড়ছে।

অনেকটা হঠাৎ করেই ১৮৩১ সালে ডারউইন বিগল্ জাহাজে করে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে শুরু করে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, আফ্রিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ৫ বছরের জন্য ঘুড়ে বেড়ানোর সুযোগ পেয়ে যান। তখন তিনি মোটে কেমব্রিজের ক্রাইষ্ট কলেজ থেকে বি এ পাশ করে বেড়িয়েছেন। ছেলেকে ডাক্তার এবং আইনজ্ঞ বানানোর চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ডারউইনের বাবা ডঃ রবার্ট ডারউইন শেষ পর্যন্ত তাকে ধর্মজাযক বানানোর জন্য এই ক্রাইষ্ট কলেজে পাঠান। কিন্তু তাতে আপাতভাবে হিতে বিপরীতই হলো! ধর্মজাযক হওয়া তো দূরের কথা, তিনিই শেষ পর্যন্ত চরম আঘাত হানলেন সানতন ধর্মের উপর তার বিবর্তন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। বীগল্ জাহাজে ওঠার সময়ও কিন্তু তিনি অন্যান্য ছাত্রদের মতই সৃষ্টিতত্ত্ব এবং জীবের স্থিতিশীলতার তত্ত্বে বিশ্বাসী একজন প্রকৃতিবিদ ছিলেন, লায়েলের তত্ত্ব তখনও তার পড়া হয়ে ওঠেনি। তাহলে, এই পাঁচ বছরের বিশ্ব-অভিযানে বেড়িয়ে ডারউইন এমন কি দেখলেন যে তার

চিত্র ২.১ : ডারউইনের ২২ বছর বয়সের ছবিঃ এ সময়ই তিনি বিগেল জাহাজের যাত্রা শুরু করেন।

চিত্র ২.২ : বিগেল জাহাজে করে ডারউইন যে পথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছিলেন
(সৌজন্যঃ http://www2.ups.edu/faculty/veseth/watson/Toby/darwins-voyage.htm)

এই ধারনাগুলোর আমুল পরিবর্তন ঘটে গেলো? আসলে, হঠাৎ করে পুরো পৃথিবী ঘুরে দেখার সুযোগ ও দক্ষিণ আমেরিকার বৈচিত্রময় প্রকৃতির সাথে তার স্বভাবজাত ধৈর্য, গভীর পর্যবেক্ষন শক্তি, অনুসন্ধিৎসু মন এবং সর্বোপরি বৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতিকে সমন্বয় করে জীবের উৎপত্তি এবং বিকাশ সম্পর্কে তিনি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন তা আমাদের হাজার বছর ধরে লালন করা সৃষ্টিতত্ত্ব সংক্রান্ত প্রাচীন এবং ধর্মীয় চিন্তা পদ্ধতিগুলোকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিলো। ডারউইনের নিজের কাছেই বিবর্তন তত্ত্বটি এতখানি বিপ্লবাত্মক মনে হয়েছিল যে তিনি তা প্রচার করতেও যথেষ্ট দ্বিধা বোধ করছিলেন। বীগল্ জাহাজের পাঁচ বছরব্যাপী বিশ্বভ্রমণ শেষ করে এসে, ১৮৩৭ সালের দিকেই প্রজাতির উৎপত্তি নিয়ে লিখতে শুরু করলেও ১৮৫৯ সালের আগে তিনি 'On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life' বা ছোট করে বললে 'প্রজাতির উৎপত্তি' বইটি প্রকাশ করেননি। হুকারের কাছে লেখা এক চিঠিতে ডারউইন এ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছিলেন যে এই তত্ত্বটি প্রস্তাব করতে গিয়ে তার নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছে, বিবর্তনের এই গল্প বলতে গিয়ে মনে হচ্ছে তিনি যেনো একজন নরঘাতক হিসেবে স্বীকারোক্তি দিচ্ছেন।

মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, ডারউইনের শিক্ষক এবং প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী প্রফেসর হেনস্লো ১৮৩১ সালে লায়েলের লেখা বইটি উপহার দেন জাহাজে বসে পড়ার জন্য। গভীরভাবে ইশ্বরে বিশ্বাসী শিক্ষকমশাই পইপই করে এও বলে দেন ডারউইন যেনো লায়েলের সব সিদ্ধান্তই আবার বোকার মত বিশ্বাস না করে বসেন! কিন্তু আবারও হিসেবে গন্ডগোল হয়ে গেলো, তিনি যতই বিশ্ব-প্রকৃতি ঘুড়ে দেখতে থাকলেন ততই এর পক্ষে আরও বেশি করে সাক্ষ্য প্রমান পেলেন [৪] এবং লায়েলের সদাপরিবর্তশীলতার ধারনাতে দীক্ষিত হয়ে উঠলেন। ডারউইন এ সময়ে মুলত ভুতত্ত্ব নিয়েই গবেষনা করছিলেন, এবং ভ্রমন শেষে তিনি ভূ-প্রকৃতি নিয়ে উল্লেখযোগ্য তিনটি বইও লেখেন। কিন্তু এর মধ্যে দিয়েই জীবজগত নিয়ে তার বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটতে থাকে, বিচিত্র ভূ-প্রকৃতির সাথে বিচিত্র সব জীবের সমারোহ দেখতে দেখতে

তিনি আরও গভীরভাবে জীবের উৎপত্তি এবং বিকাশ নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের চিলির উপকুলে নোঙ্গর করা বীগল্ জাহাজের ভিতরে হঠাৎ একদিন ভীষণভাবে আঁতকে উঠলেন ডারউইন সহ জাহাজের অন্যান্য বাসিন্দারা, দুই মিনিট ধরে যেনো এক মহাপ্রলয় ঘটে গেলো সারা পৃথিবী জুড়ে। ভুমিকম্প শেষ হলে ডারউইন এবং বীগেলের ক্যাপটেন ফিটজরয় সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন যে, উপকুলের ভূমির উচ্চতা বেড়ে গেছে প্রায় ৮ ফুট! তাহলে কি লায়েলের হিসাবই ঠিক? সেই অনাদিকাল থেকে প্রাকৃতিক শক্তিগুলোই পরিবর্তন করে আসছে আমাদের এই পৃথিবীর চেহারা? আবার একদিন কেপ ভার্ডে নামে এক দ্বীপপুঞ্জে নেমে তিনি দেখলেন একটি সাদা দাগ চলে গেছে মাইলের পর মাইল জুড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে [১]। কৌতুহলী ডারউইন পরীক্ষা করে বুঝলেন যে, এগুলো আর কিছুই নয়, বহু বছর ধরে শামুক ঝিনুকের খোলসের চুনাপাথর থেকে এই সাদা দাগের উৎপত্তি ঘটেছে, ঠিক একইরকম দাগ বয়ে চলে গেছে সমুদ্রের পার বেয়েও। ডারউইন আবারও লায়েলের তত্ত্বের স্মরণাপন্ন হতে বাধ্য হলেন, তার মানে সমুদ্রের পার থেকে ৪৫ ফুট উপরের এই এলাকাটি এক সময় সমুদ্রের নীচে ছিলো এবং অগ্নুৎপাতের ফলে সমুদ্রের নীচ থেকে এত উপরে উঠে এসেছে! প্রকৃতিতে এরকম বড় বড় পরিবর্তনের উদাহরনের তো কোন অভাব নেই, যেমন, মানচিত্র খুললে আজ যে ৭ টি মহাদেশ আমরা একেক জায়গায় দেখি, তিনশো কোটি বছর আগে কিন্তু এভাবে ছিলো না। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেন যে, মহাদেশীয় সঞ্চারনের (Continental drift) মাধ্যমে এক সময় তারা আলাদা হয়ে বিভিন্ন মহাদেশের উৎপত্তি হয় এবং এই সঞ্চারন আজও ঘটে চলেছে বিরামহীনভাবে। সে যাই হোক, এখন আবার ফিরে যাওয়া যাক আমাদের আসল গল্পে। ডারউইন লায়েলের এই তত্ত্বকেই পরবর্তীতে কাজে লাগান জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, যদিও লায়েল নিজে প্রজাতির পরিবর্তনের ধারণাকে ভুল বলে মনে করতেন। চারপাশের বিচিত্র প্রাণী আর উদ্ভিদের সমারোহ দেখতে দেখতে ডারউইনের সন্দেহ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে যে জীবজগতও স্থির হতে পারে না, এদের অতীতে পরিবর্তন ঘটেছে এবং আজও তা ঘটে চলেছে। বীগল্ জাহাজে ভ্রমনকালীন সময়ে তিনি দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কয়েকটি বড় বড় অভিযান চালান। এরকম একটি থেকে ফিরে এসে তিনি তার বোন সুজানকে লেখা একটি চিঠিতে বলেন যে এটি ছিলো তার সবচেয়ে সফল অভিযান কারণ এর পরই তিনি নিশ্চিত হন যে,

> আসলে এত দিন ধরে চলে আসা ভূ-প্রকৃতির স্থিতিশীলতার তত্ত্বটি ভুল, লায়েলের সদা-পরিবর্তনশীল ভূ-প্রকৃতির ধারণাই আসলে সঠিক। এই উপলব্ধিটিই পরবর্তিতে প্রানের বিবর্তন সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসার ব্যাপারে অগ্রনী ভুমিকা পালন করে [৮]।

তখনও অন্যান্য ফসিলবিদদের আবিষ্কৃত বেশ কিছু ফসিলের উদাহরণ ছিলো ডারউইনের সামনে, কিন্ত সেগুলোর উপর তার মূল সিদ্ধান্ত ভিত্তি না করে তিনি বেশীরভাগ উদাহরণই সংগ্রহ করেন প্রকৃতিতে বিদ্যমান বিচিত্র প্রাণী এবং উদ্ভিদ থেকে। তিনি প্রকৃতিতে এত বৈচিত্রময় প্রাণের সমাহার এবং তাদের মধ্যকার বিপুল সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য দেখে বিস্মিত হন। একই ধরনের কাছাকাছি শারীরিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রজাতিগুলোকে কেন সাধারণত একই মহাদেশে বা কাছাকাছি দ্বীপপুঞ্জেই দেখা যায়? আবার অন্যদিকে এই প্রতিটি প্রজাতির খাদ্যাভ্যাস, বা বসবাসের পরিবেশের মধ্যে কেন এতো লক্ষণীয় রকমের পার্থক্য

দেখা যায়? কেন আফ্রিকা মহাদেশেই শুধু বিভিন্ন প্রজাতির জেব্রা দেখা যায়, মারসুপিয়াল (পেটের কাছের থলিতে বাচ্চা বড় করতে পারে এমন ধরনের প্রাণীদের মারসুপিয়াল বা Marsupian জাতীয় প্রাণী বলা হয়) জাতীয় ক্যাঙ্গারু বা কোয়ালা কেন পাওয়া যায় শুধু অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে? আবার দক্ষিণ আমেরিকার দ্বীপে উড়তে অক্ষম দু'ধরনের বেশ বড় আকৃতির পাখি দেখা গেলেও অস্ট্রেলিয়ার ইমু বা আফ্রিকার উটপাখীর সাথে তাদের কোন মিল নেই। স্থলচর প্রাণীর মধ্যে ইউরোপের মত এখানে খরগোশ নেই, আছে কয়েক ধরনের তীক্ষ্ণ দাঁতসম্পন্ন অন্য ধরনের ইঁদুর, জলচর প্রাণীর মধ্যে কয়পাস (coypus) বা ক্যাপিব্যারাসের (capybaras) মত প্রাণী থাকলেও, বিবর জাতীয় (beaver) প্রাণীর তো দেখা পাওয়া যাচ্ছে না এখানে! গ্যালাপ্যাগাস দ্বীপপুঞ্জে এবং তার কাছাকাছি এলাকাগুলোতে ১৪ ধরনের প্রজাতির ফিঞ্চ পাখী, ১৬ প্রজাতির শামুক, তিন রকমের প্রকান্ড আকারের কচ্ছপ এবং গিরগিটির মত দেখতে কয়েক প্রজাতির ইগুয়ানা দেখা যায় যেগুলো পৃথিবীর আর কোন অঞ্চলে দেখা যায় না। দক্ষিণ আমেরিকায় আরও আছে টেপির, চিনচিলা, আর্মাডিলা, লামা, জাগুয়ার, প্যান্থার, বিশাল আকৃতির পিপিলিকাভূক এবং আরও অনেক প্রাণী যাদেরকে আফ্রিকা মহাদেশে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আবার আফ্রিকার সিংহ, হাতি, গন্ডার, জলহস্তী, জিরাফ, হায়েনা, লেমুর, শিম্পাঞ্জির মত প্রাণীগুলো সম্পূর্নভাবে অনুপস্থিত সেই মহাদেশে। এ প্রসংগে বলতে গিয়ে তিনি তার বইতে লিখেন, জৈব-ভৌগলিক উদাহরণগুলো নিয়ে যারা কাজ করছেন, তারা নিশ্চয়ই 'কাছাকাছি প্রজাতিগুলোর' মধ্যে একই ধরনের বৈশিষ্ট্যের বা প্যাটার্নের রহস্যময় সমন্বয় দেখে অবাক না হয়ে পারেন না [৫]।

ডারউইন এই গ্যালাপ্যাগাসের দ্বীপগুলোতেই সবচেয়ে বিচিত্র ধরনের প্রজাতির নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন, যা তাকে পরবর্তীতে বিবর্তনের পক্ষের প্রমাণগুলো প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে। গ্যালাপ্যাগাসের বিভিন্ন দ্বীপগুলোতে যে ১৪ ধরনের ফিঞ্চ দেখতে পাওয়া যায় তাদের মধ্যে ডারউইন নিজেই ১৩ টি সংগ্রহ করেছিলেন। এই ফিঞ্চ পাখিগুলো হচ্ছে বিবর্তনীয় অভিযোজন (adaptation) বা বিবর্তনের ফলে এক প্রজাতি থেকে বিচিত্র বহু ধরনের প্রজাতি উৎপত্তি হওয়ার একটি চমৎকার উদাহরণ। বিস্মিত ডারউইন লক্ষ্য করলেন যে, তাদের সার্বিক দৈহিক গঠনে প্রচুর মিল থাকলেও ঠোটের আকৃতি ও গঠনে বেশ উল্লেখযোগ্য রকমের পার্থক্য রয়েছে। এদের মধ্যে আবার ছয়টি মাটিতে বাস করে এবং বাকিরা থাকে গাছে। যারা মাটিতে থাকে তাদের মধ্যে একটি অংশ বিভিন্ন ধরনের বীজ খেয়ে বেঁচে থাকে আর বাকীদের প্রধাণ খাদ্য হচ্ছে ক্যাকটাস জাতীয় গাছের ফুল। দেখা গেলো যারা বীজ খায় তাদের ঠোঁট বেশ মোটা যা তাদেরকে বীজ ভাঙ্গতে সহায়তা করে, আবার যারা ক্যাকটাসের ফুল খায় তাদের ঠোঁটগুলো হচ্ছে সোজা এবং খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ফুল খাওয়ার উপযোগী। যারা গাছে থাকে এবং পোঁকা মাঁকড় ধরে খায় তাদের ঠোঁটের আকৃতি আবার ঠিক সেরকমই লম্বা যাতে তারা গর্ত থেকে পোঁকা ধরে নিয়ে আসতে পারে। ডারউইন এই পর্যবেক্ষণ থেকে লিখেলেন, 'সবচেয়ে কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় হচ্ছে এই প্রজাতিগুলোর ঠোঁটের নিখুঁত ধাপে ধাপে ঘটা ক্রমবিকাশ ...একটি ছোট ও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত পাখির দলের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের এই ক্রমাগত রূপান্তর ও বৈচিত্র দেখে যে কেউ অবশ্য কল্পনা করতে পারে যে এই দ্বীপগুলোতে পাখির প্রাথমিক অভাব দুর করার জন্য একটি মুল প্রজাতি থেকে নিয়ে বিভিন্ন পরিবেশের জন্য উপযোগী ও পরিবর্তন করে অন্যদের তৈরী করা হয়েছে' [৬]।

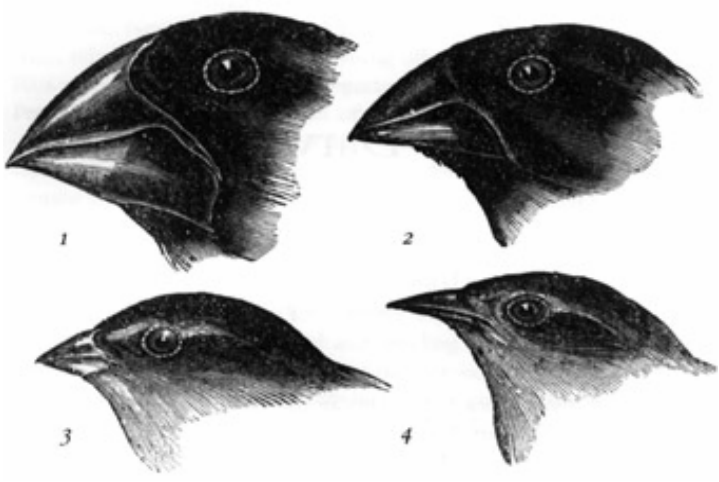

চিত্র ২.৩ : ডারউইনের আঁকা কয়েকটি প্রজাতির ফিঞ্চের ছবি
(সৌজন্যঃ Darwin's *Journal of Researches:* (1) large ground finch (2) medium ground finch (3) small tree finch (4) warbler finch)

তিনি পরবর্তিতে তার বইতে লেখেন,

> বিভিন্ন জীবের মধ্যে এলাকা এবং সময় বিশেষে এই নিবিড় সম্পর্কের কারণ উত্তরাধিকার ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না, অর্থাৎ এই কাছাকাছি ধরনের প্রজাতিরা সাধারণত খুব কাছাকাছি এলাকায় বাস করে কারণ তারা একসময় একই পুর্বপুরুষ থেকে পরিবর্তিত হতে হতে বিভিন্ন প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে [৫]।

এতদিনের সৃষ্টিতত্ত্ব আমাদেরকে যা শিখিয়ে এসেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে ধরে নিতে হবে যে, কোন এক সৃষ্টিকর্তা বিভিন্ন পরিবেশের সাথে উপযোগী করে বিভিন্ন জায়গার প্রাণী এবং উদ্ভিদ তৈরী করেছিলেন। কিন্তু এই যুক্তির সাথেই কি বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমান উদাহরণের কোন মিল পাওয়া যাচ্ছে? তাহলে তো একই ধরনের জলবায়ু এবং ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জায়গাগুলোতে একই রকমের প্রাণী দেখা যাওয়ার কথা ছিলো! ডারউইন দেখলেন যে, বিভিন্ন মহাদেশের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে মিল বা অমিল - কোনটাকেই শুধুমাত্র পরিবেশগত পার্থক্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। যেমন, অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের প্রাণীগুলোর সাথে অন্য মহাদেশের প্রাণীর তেমন কোন মিল নেই, আবার আমরা দেখেছি যে, দক্ষিণ আমেরিকার প্রাণীগুলোও দেখতে বেশ অন্যরকম। অথচ ইউরোপ, এশিয়া বা আফ্রিকার বিভিন্ন জায়গায় তো অষ্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ আমেরিকার মত পরিবেশ দিব্যি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে! আবার গ্যালাপ্যাগাস বা দক্ষিণ আমেরিকার কাছাকাছি দ্বীপগুলোর প্রাণীদের সাথে তার মুল ভুখন্ডের প্রাণীদের যেরকম মিল পাওয়া যাচ্ছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জীবজন্তুর সাথে তা পাওয়া যাচ্ছে না। ডারউইন যদি

এই দ্বীপগুলোতে সম্পূর্ন নতুন ধরনের প্রাণী দেখতেন তাহলে সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে তার মনে হয়তো প্রশ্ন উঠতো না, কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার মুল ভুখন্ডের সাথে তাদের এই পরিমাণ সাদৃশ্য তাকে ভাবিয়ে তুলেছিলো। তিনি প্রশ্ন করলেন, সৃষ্টির সময় এইসব দ্বীপে যদি বিভিন্ন জীবদের রেখে দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে এদের গায়ে দক্ষিণ আমেরিকার ছাপ কেনো? আবার ঠিক বিপরীতভাবে দেখা যাচ্ছে, কাছাকাছি জায়গার দ্বীপগুলোতে বাস করা বিভিন্ন প্রজাতির জীবজন্তুর মধ্যে রয়েছে অকল্পনীয় রকমের বৈচিত্র! বিস্মিত হয়ে ডারউইন লিখলেন যে তিনি এত কাছাকাছি, মাত্র ৫০-৬০ মাইল দুরে অবস্থিত দ্বীপগুলো, যাদের একটি থেকে অন্যটিকে খালি চোখে দেখা যায়, যারা একই শীলায় তৈরী, একই জলবায়ুর অধীন, এমনকি যাদের উচ্চতাও এক - তাদের মধ্যে এত ভিন্ন ধরনের বাসিন্দা দেখা যাবে তা স্বপ্নেও আশা করেননি [১]।

দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া নানা ধরনের প্রাণীর ফসিলও চোখে পড়েছিলো ডারউইনের। বহুদিন আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া এইসব প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যের সাথে আজকের পৃথিবীর প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য তুলনা করে তিনি প্রজাতির স্থায়িত্ব নিয়ে আরও সন্দিহান হয়ে পড়লেন। পৃথিবীর বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক স্তরে কেনো বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর ফসিল পাওয়া যাচ্ছে? ভুতাত্ত্বিকভাবে যেমন অপেক্ষাকৃত পুরানো স্তরের উপরে থাকে তার চেয়ে কম পুরানো স্তরটি, ঠিক একইভাবে যে জীব যত প্রাচীন তার ফসিলও পাওয়া যায় ততই প্রাচীন স্তরের মধ্যেই। ডারউইন লক্ষ্য করলেন, কাছাকাছি বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন প্রজাতির প্রানী বা উদ্ভিদের ফসিলগুলোকে সময়ের ধারাবাহিকতায় তৈরি একটির উপরে আরেকটি ভুতাত্ত্বিক স্তরের মধ্যেই শুধু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে কি একটি প্রজাতির থেকে কাছকাছি আরেকটি প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে নাকি এধরনের মিলগুলোকে কেবলই কাকতালীয় ঘটনা বলে ধরে নিতে হবে? কিন্তু ফসিল রেকর্ডে তো স্পষ্টভাবেই দেখা যাচ্ছে যে একটি প্রাণী হাজার বছর ধরে টিকে থেকে একসময় বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, কোন স্তরেই তার আর কোন ফসিল পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু ঠিক তার উপরের স্তরেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে খুবই সাদৃশ্যপুর্ণ আরেকটা নতুন ধরনের প্রজাতি।

> শুধু দেড়শো বছর আগে ডারউইনের সময়ই নয়, একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এসেও এখন পর্যন্ত এমন একটি ফসিল পাওয়া যায়নি যা কিনা এই নিয়মের বাইরে পড়েছে। কয়েকদিন আগে, ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরের ১ তারিখে বিবর্তনের বিপক্ষ শক্তির প্রচারনাকে খন্ডন করতে গিয়ে আজকের দিনের বিখ্যাত বিবর্তনবাদী প্রফেসর রিচার্ড ডকিনস বলছেন, *".. And far telling - not a single authentic fossil has ever been found in the "wrong" place in the evolutionary sequence. Such an anachronistic fossil, if one were ever unearthed, would blow evolution out of the water.."* [৭].

একটি বহুল আলোচিত উদাহরণ দেওয়া যাক এ প্রসঙ্গে। উত্তর আমেরিকায় এক্কেবারে নীচের দিকের প্রাচীন স্তরে (প্রায় ৫ কোটি বছর আগের) পাওয়া গেছে খানিকটা ঘোড়ার মত দেখতে *Hyracotherium* নামক একটি প্রাণী, তারপর বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন সময়ে পাওয়া গেছে *Orohippus* , *Epihippus* ,

Mesohippus , *Hipparion*, *Pliohippus* এবং আরও অনেক ধরনের মাঝামাঝি ধরনের ঘোড়ার ফসিল। কিন্তু প্রায় ৫০ লক্ষ বছর আগে এদের একটি প্রজাতি ছাড়া বাকি সবাই বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং এর

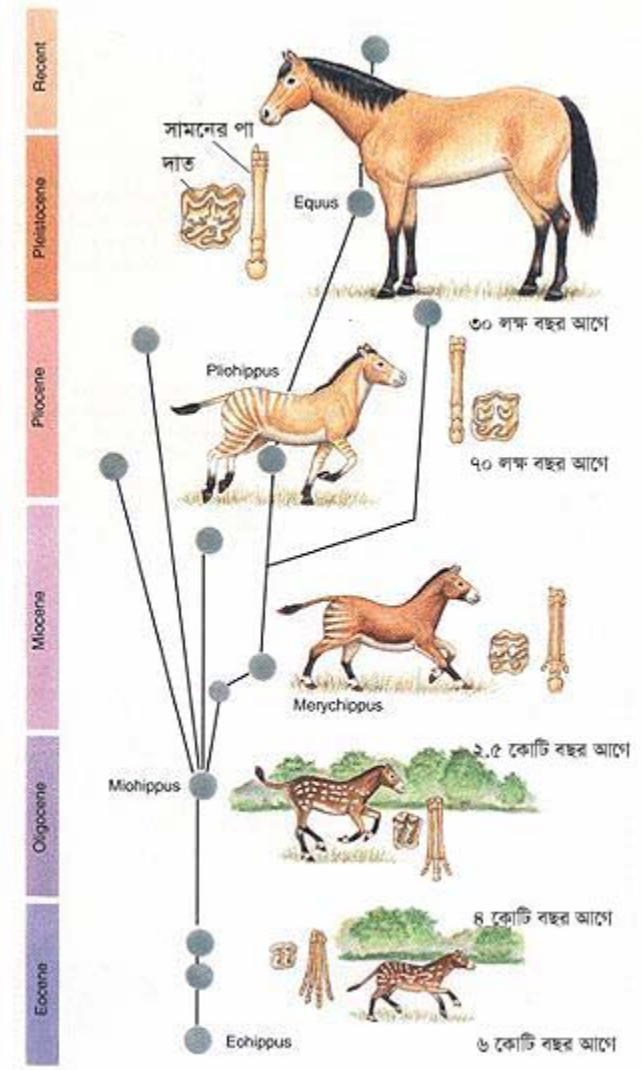

চিত্র ২.৪ : ঘোড়ার বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর

(সৌজন্যঃ University Of Texus Web page :
http://www.micro.utexas.edu/courses/levin/bio304/evolution/evol.proc.html)

থেকেই পরবর্তীতে উৎপত্তি হয় আজকের যুগের আধুনিক ঘোড়ার বিভিন্ন প্রজাতি। ডারউইনের সময় এতো ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন স্তরের ফসিল পাওয়া না গেলেও তিনি এর পিছনের সম্ভাব্য কারণটি ঠিকই খুঁজে বের করতে পেরেছিলেন।

> তিনি এ ধরনের উদাহরণগুলো থেকে ক্রমশঃ সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে থাকেন যে, ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত প্রজাতিরা বিবর্তনের মাধ্যমে একে অন্যকে প্রতিস্থাপিত করেছে। তিনি বলেন, 'সমস্ত ফসিলকে দুভাগে ভাগ করা যায়, হয় তারা বর্তমান কোন গোষ্ঠীর মধ্যে পড়বে, নয় তো তাদের জায়গা হবে দুটি গোষ্ঠির মধ্যের কোন জায়গায়'।

এই মুহূর্তে ফসিল রেকর্ড নিয়ে আর বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না, বিবর্তন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ফসিল রেকর্ডের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রয়েছে, তাই পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এ বিষয়ে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার সাথে বিভিন্ন প্রজাতির মিল বা আমিলের কি কোন সম্পর্ক রয়েছে? পরবর্তীকালে ডারউইন বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং তার সংগৃহীত অসংখ্য জীবিত এবং ফসিলের নমুনা থেকে উপলব্ধি করেন যে, ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার সাথে বিভিন্ন প্রজাতির সাদৃশ্য বা অসাদৃশ্যের একটি সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। তিনি বললেন,

> দুটি এলাকা যদি দীর্ঘকাল ধরে বিচ্ছিন্ন থাকে, তাদের মাঝে মহাসমুদ্র, খুব উচু পর্বতশ্রেনী বা এধরনের অন্য কোন প্রতিকুল বাঁধা থাকে যা অতিক্রম করে প্রানীরা অন্য দিকে পৌঁছুতে পারবে না, তাহলে তাদের স্থানীয় জীবজন্তু, গাছপালাগুলো স্বতন্ত্রভাবে বিবর্তিত হতে শুরু করবে এবং এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ক্রমাগতভাবে চলতে চলতে দীর্ঘকাল পর দেখা যাবে যে, এই দুই অঞ্চলের প্রানীদের অনেকেই অন্যরকম প্রজাতিতে পরিনত হয়েছে। আবার যে অঞ্চলগুলোর মধ্যে এ ধরনের কোন বাধার দেওয়াল নেই, সেখানে বিস্তীর্ন অঞ্চল বা সমস্ত এলাকা জুড়েই একই ধরনের জীব দেখা যাবে[৮]।

এ প্রসঙ্গে দু'টি মজার উদাহরণ দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না। আমরা সাধারণত মারসুপিয়াল (ক্যাঙ্গারু, কোয়ালা,ইত্যাদি প্রাণী) জাতীয় প্রাণীর বাসস্থান বলতে অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশকেই বুঝি। কিন্তু শুধু অস্ট্রেলিয়া নয়, দক্ষিণ আমেরিকায় আজও গুটিকয়েক মারসুপিয়াল জাতীয় প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়। এর কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয়, একসময় দক্ষিণ আমেরিকা অ্যান্টারটিকার মাধ্যমে অষ্ট্রেলিয়ার সাথে সংযুক্ত ছিলো, তখন সেখান থেকে মারসুপিয়াল জাতীয় প্রাণীগুলো অ্যান্টারটিকা হয়ে অষ্ট্রেলিয়ায় পৌঁছায়। তারপর দক্ষিণ আমেরিকায় কয়েকটি ছাড়া প্রায় সবগুলো মারসুপিয়াল প্রাণী বিলুপ্তির পথ ধরলেও অষ্ট্রেলিয়ায় তারা আধিপত্য বিস্তার করে নেয়। আর ইতিমধ্যে অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা এবং

অ্যান্টারটিকা একে অপরের থেকে সম্পুর্নভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, আর তার ফলে অষ্ট্রেলিয়ায় তাদের বিবর্তন ঘটতে থাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে, নিজস্ব গতিতে, যার ফলশ্রুতিতেই আমরা আজকে অষ্ট্রেলিয়ায় এতো বিচিত্র প্রাণীর সমাবেশ দেখতে পাই, যার নমুনা অন্যান্য আঞ্চলে দেখা যায় না বললেই চলে। আর অন্যদিকে, বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে অ্যান্টারটিকা মহাদেশের পরিবেশ ক্রমাগতভাবে খুব বেশী ঠান্ডা হয়ে যাওয়ায় সেখানকার সব স্তন্যপায়ী প্রাণী-বিলুপ্ত হয়ে যায়। আবার ঠিক এর বিপরীত ঘটনা ঘটতে দেখা যায় ঘোড়ার ইতিহাসের ক্ষেত্রে। আমরা ফসিল রেকর্ড থেকে আগেই দেখেছি যে, উত্তর আমেরিকায় প্রথম ঘোড়ার পুর্বপুরুষের উদ্ভব ঘটে। যখন উত্তর আমেরিকা, প্রায় ২০-৩০ লক্ষ বছর আগে, তার উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে রাশিয়ার মাধ্যমে এশিয়া মহাদেশের সাথে সংযুক্ত ছিলো তখন আধুনিক ঘোড়ার একটা অংশ এশিয়া হয়ে ইউরোপ এবং আফ্রিকা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, এবং পরবর্তীতে এই মহাদেশগুলোর সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। একসময়, উত্তর আমেরিকার সাথে এশিয়ার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন কারণে ১০-১৫ হাজার বছর আগে উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ঘোড়াও সম্পুর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু পনেরশো শতাব্দীতে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর আবার নতুন করে ইউরোপ থেকে আমেরিকায় ঘোড়ার আমদানী করা হয়। ডারউইন এপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে স্তন্যপায়ীদের ইতিহাসে নিশ্চয়ই এটি একটি চমৎকার ঘটনা, দক্ষিণ আমেরিকাতে তার নিজস্ব ঘোড়া ছিলো, তা বিলুপ্ত হয়ে গেলো, কিন্তু বহুকাল পরে স্পেনীয়দের আনা কয়েকটি ঘোড়ার বংশধর তাদের স্থান দখল করে নিলো [১]। এই ভাবেই ভৌগলিকভাবে সংযুক্ত এলাকাগুলোর বিস্তীর্ন অঞ্চল জুড়ে একই প্রজাতির প্রাণী বা উদ্ভিদের অস্তিত্ব দেখা যায়। ঘোড়া যদি এশিয়া, ইউরোপে ছড়িয়ে না পড়তো, বা তারা ছড়িয়ে পড়ার আগেই যদি উত্তর আমেরিকা এবং রাশিয়ার মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো (যা পরবর্তীতে হয়েছে) তাহলে আজকে হয়তো পৃথিবীর বুকে আর ঘোড়ার অস্তিত্বই থাকতো না!

বিবর্তন প্রক্রিয়া যদি সত্যিই প্রকৃতিতে কাজ করে থাকে তবে যে প্রাণী যত পরে অন্য প্রাণী থেকে বিবর্তিত হয়ে নতুন প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে, তার সাথে তার ঠিক আগের পুর্বপুরুষের শারীরিক পার্থক্য ততই কম হবে বলে আশা করা যায়। এ ক্ষেত্রে ঠিক তাই হয়েছে। বিভিন্ন প্রাণীর শারীরিক গঠনের মধ্যে এই সাদৃশ্য দেখেও ডারউইন বিস্মিত না হয়ে পারেন নি। বিভিন্ন মেরুদন্ডী প্রাণীর সামনের হাত বা অগ্রপদের মধ্যে কি অস্বাভাবিক মিলই না দেখা যায়! ব্যাঙ, কুমীর, পাখি, বাদুর, ঘোড়া, গরু, তিমি মাছ এবং মানুষের অগ্রপদের গঠন প্রায় একই রকম। এখন আমরা আধুনিক জেনেটিক্স-এর জ্ঞান থেকেও জানতে পারছি যে, এরকম বিভিন্ন প্রাণীর ডিএনএর মধ্যেও লক্ষ্যণীয় মিল দেখা যায়। ডারউইনের সময় বিজ্ঞানীদের ডিএনএ-এর গঠন বা জেনেটিক্স সম্পর্কে কোন ধারণা ছিলো না, তিনি প্রাণীদের মধ্যে শারীরিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য দেখে অবাক হয়ে লেখেন, 'হাত দিয়ে মানুষ কোন কিছু ধরে, আর ছুঁচো তা দিয়ে মাটি খুঁড়ে। ঘোড়ার পা, শুশুকের প্যাডেল ও বাদুরের পাখার কাজ ভিন্ন। অথচ এদের সবার হাত বা অগ্রপদের গঠন শুধু একই প্যাটর্নেরই নয়, তুলনামুলকভাবে একই জায়গায় আছে একই নামের অস্থিগুলো ..... এর থেকে অদ্ভুত আর কি হতে পারে?' [১]।

বিবর্তনের আরেকটি বেশ গুরুত্বপুর্ণ সাক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন প্রাণীর শরীরে এখনও বিদ্যমান বিলুপ্তপ্রায় (Vestigeal Organs) এবং অপ্রয়োজনীয় অংগগুলো। তিমি মাছের সমুদ্রে বাস করার জন্য পায়ের দরকার নেই, কিন্তু এখনও পিছনের পায়ের হাড় গুলো কেনো রয়ে গেছে তার? সাপের পাঁচ পা হয়তো দেখা যায় না, কিন্তু কিছু সাপের শরীরে কেনো এখনও রয়ে গেছে পায়ের হাড়ের অংশগুলো? উড়তে

পারে না এমন অনেক পাখি, পোকা বা আরশোলার পাখা রয়ে গেছে। মানুষের তো লেজ থাকার কথা নয়,

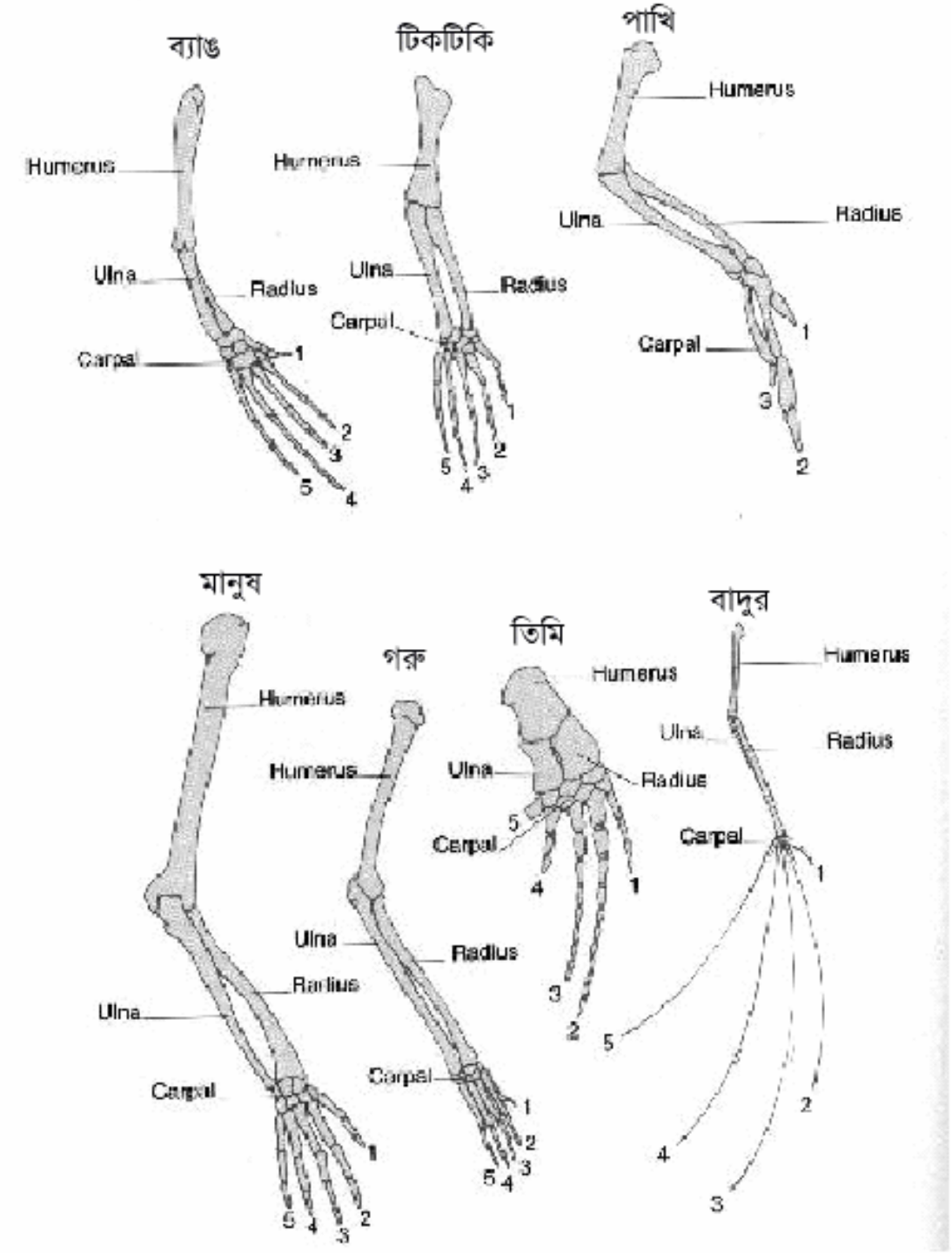

চিত্র ২.৫ : বিভিন্ন প্রাণীর অগ্রপদের হাড়ের মধ্যে সাদৃশ্য
(সৌজন্যঃ ইউনিভারসিটি অফ ব্রিটিশ কলাম্বিয়া,
http://www.zoology.ubc.ca/~bio336/Bio336/Lectures/Lecture5/Overheads.html)

তাহলে লেজের হাড়ের অংশগুলো কি করছে আমাদের শরীরে? এ্যাপেনডিক্সের প্রয়োজন ঘাসসহ বিভিন্ন ধরনের সেলুলোজ-সমৃদ্ধ খাওয়া হজম করার জন্য, মানুষ তো ঘাস খায় না, তাহলে এ অংগটির কি প্রয়োজন ছিল আমাদের? তারপরে ধরুন, আক্কেল দাঁত বা ছেলেদের শরীরের স্তনবৃন্ত - এগুলোরই বা কি দরকার? প্রকৃতিতে এমন ধরনের উদাহরণের কোন শেষ নেই - বোঝাই যাচ্ছে যে,

> এই বিলুপ্তপ্রায় অংগগুলো একসময় পূর্বপুরুষদের কাজে লাগলেও, এখন বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় পরিবর্তিত প্রানীদের দেহে এরা আর কোন কাজে আসে না।

তবে ডারউইন দীর্ঘকাল ধরে অব্যবহারের ফলে এই অংগগুলো একসময় ছোট এবং অকেজো হয়ে পড়ে বলে যে ধারণা করেছিলেন পরবর্তীতে বংশগতিবিদ্যার জ্ঞানের আলোকে তা ভুল বলে প্রমাণিত হয়। ডারউইনের সময় জেনেটিক্স বা বংশগতি সম্পর্কে তার নিজের এবং সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের কোন ধারণা ছিল না, তার ফলে তিনি কয়েকটি ব্যাপারে সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হলেও পরবর্তীতে প্রমাণিত হয় যে বিবর্তন সম্পর্কে তার মুল ধারণার সবগুলিই প্রায় সঠিক ছিলো। বিখ্যাত ফসিলবিদ Stephen Jay Gould এর ভাষায়, "Odd arrangements and funny solutions are the proof of evolution-paths that a sensible God would never tread but that a natural process, constrained by history follows perforce" (Gould 1980; Gould in Pennock 2001, 670).

এ ধরনের হাজারো উদাহরণ টেনে ডারউইন প্রমাণ করেন যে, এগুলো থেকে একদিকে যেমন বোঝা যায় আমাদের চারদিকের সৃষ্টিগুলোতে কি পরিমান খুঁত রয়ে গেছে, অন্যদিকে এটাও প্রমাণিত হয় যে আমাদেরকে আলাদা আলাদা করে কোন সৃষ্টিকর্তার হাতে যত্ন করে সৃষ্টি করা হয়নি, আমরা এসেছি কোন না কোন পুর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়ে। তিনি তার 'প্রজাতির উৎপত্তি' বইটিতে এতো রকমের উদাহরণ দিয়ে তার বিবর্তনের তত্ত্ব প্রমাণ করেছিলেন যে আজও তা বিস্ময়কর বলেই মনে হয়। বিবর্তনের মাধ্যমেই জীবের পরিবর্তন হতে হতে একসময় নতুন প্রজাতির উৎপত্তি হচ্ছে, আর এই বিরামহীন পরিবর্তনই কাজ করে চলেছে আমাদের বেঁচে থাকার চাবিকাঠি হিসেবে। ডারউইন তার সময়ের থেকে এতখানিই অগ্রগামী ছিলেন যে, তার মতবাদকে সঠিক বলে প্রমাণ করতে আমাদের আরও অনেকগুলো দশক পার করে দিতে হয়েছিলো। বিজ্ঞান যতই এগিয়েছে ততই গভীরভাবে প্রমাণিত হয়েছে তার তত্ত্বের যথার্থতা।

আমরা আগেই দেখেছি যে, ডারউইন বীগল্ জাহাজে ওঠার সময় জীবের স্থিতিশীলতার তত্ত্বে বিশ্বাসী একজন প্রকৃতিবিদ ছিলেন, পাঁচ বছর ধরে তিনি যতই বিভিন্ন দ্বীপে ঘুরলেন, খুব কাছ থেকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে চারদিকের প্রকৃতিকে দেখলেন ততই তার সন্দেহ বাড়তে লাগলো। আর তারই ফলশ্রুতিই আমরা পরবর্তীতে পেলাম জীবের বিবর্তনের মতবাদ। বীগল্ যাত্রা থেকে ফিরে আসার সময়ই তিনি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সন্দেহ করতে শুরু করেন যে, জীবজগৎ স্থির নয়, বিবর্তনের ফলে এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতির উৎপত্তি হয়ে আসছে অনাদিকাল থেকেই। কিন্তু তিনি খুব ভালো ভাবেই জানতেন যে,

একথা আরও কয়েকজন প্রকৃতিবিদও বলেছেন তার আগে - তাদের সেই মতবাদ আদৌ ধোপে টেকেনি! তাই তিনি ১৮৩৬ সালে ইংল্যান্ডে ফিরে এসে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, বিবর্তনের ধারণাটি শুধু প্রকাশ করলেই হবে না, কিভাবে ঘটে তা পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণসহ উপস্থাপন করতে না পারলে তার মতবাদকেও অন্যদের মতই ইতিহাসের আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। ঠিক করলেন, গোপনে তার কাজ চালিয়ে যাবেন - আর তারপরই শুরু হলো সেই দীর্ঘ যাত্রা, প্রায় ২০ বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন তা শুধু ১৮৫৮ সালেই পৃথিবী জুড়ে হইচই ফেলে দেইনি আজও তার জের চলছে পুরোদমেই। আর এই ২০ বছরের সাধনার ফল থেকেই আমরা পেলাম ডারউইনের সেই যুগান্তকারী প্রস্তাব - প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমেই ঘটে চলেছে প্রাণের বিবর্তন।

তথ্যসূত্র:

১. আখতারজ্জামান,ম, ২০০২, বিবর্তনবাদ, হাসান বুক হাউস, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃঃ ১৩-১৬।

২. Russel B, 1946, History of Western Philospphy, George Allen and Unwin Ltd, London, p 157.

৩. Carl Linnaeus, The University of California Museum of Paleontology, http://www.ucmp.berkeley.edu/history/linnaeus.html

৪. Charles Lyell: Principles of Geology, PBS, http://www.pbs.org/wgbh/evolution/library/02/4/l_024_01.html

৫. Was Darwin, 2004, Wrong, National Geographic Magzine, Nov. ed.

৬. Berra MT, 1990, Evolution and the Myth of Creationism. Stanford University Press, Stanford, California

৮. সুশান্ত মজুমদার, ২০০৩, চার্লস ডারউইন এবং বিবর্তনবাদ, প্রকাশকঃ সোমনাথ বল, কোলকাতা, ইন্ডিয়া।

৭. http://www.guardian.co.uk/life/feature/story/0,13026,1559743,00.html

তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য

{বন্যা আহমেদের *বিবর্তনের পথ ধরে* বইটি অবসর প্রকাশনী থেকে ২০০৭ এর একুশে বইমেলায় প্রকাশিতব্য। এই অংশটি বইটির দ্বিতীয় অধ্যায়।}